পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লোকগান-পালাগান

লোকগান-পালাগান লোকসমাজের সৃষ্টি। 'লোক' শব্দটির মধ্যে গোষ্ঠীচেতনার ইঙ্গিত মেলে। লোকসমাজের অনেক মানুষ নিরক্ষর হলেও এঁদের সৃজনীশক্তির আলোয় লোকগান-পালাগান পুষ্ট হয়েছে।

লোকগান-পালাগান লিখিত আকারে সংরক্ষণের অভাব। বংশানুক্রমে এই ধারা জিইয়ে থাকে। লিখিত অবয়ব না থাকলেও লোকগান-পালাগান কোনো শৃঙ্খলাহীন বিষয় নয়। তবে মঙ্গলকাব্যের গান, পদাবলি ও কয়েকটি পর্যায়ের লোকগানে লিখিত পাণ্ডুলিপির ওপর আস্থা রাখেন এই ধারার শিল্পীরা। দর্শকশ্রোতার চাহিদা ও সময়ের সঙ্গে সংগতি রাখতে গিয়ে নতুন নতুন উপকরণ এতে ঠাঁই পাচ্ছে।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে মোটামুটি দশটি ধারার লোকগান পরিবেশিত হয়–

১) গম্ভীরা গান
২) চণ্ডীমঙ্গলের গান
৩) মনসাগান
৪) কীর্তন
৫) বাউলগান
৬) খনগান

৭) আলকাপগান

৮) ভাওয়াইয়াগান

৯) যাত্রাপালা ও

১০) অন্যান্য ধারার লোকগান ও পালাগান

১) গম্ভীরাগান :

গম্ভীরার উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেন তার বীজ অত্যন্ত প্রাচীন। অধুনা গম্ভীরা বলতে আমাদের রাজ্যের মালদহ জেলার লোক সংস্কৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়।

মূলত শৈবধর্মকেন্দ্রিক এই উৎসব চৈত্র সংক্রান্তির সময় শুরু হত। গম্ভীরার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্পষ্ট নয়। গম্ভীরার সাধারণ অর্থ প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরি।[১] বিশেষ অর্থে চৈতন্যদেবের পুরীর বাসস্থানকে গম্ভীরা বলা হয়।[২] কিন্তু মালদহ জেলার গম্ভীরার সঙ্গে চৈতন্যদেবের বাসস্থানের কোনও সম্পর্ক নেই। 'গম্ভীর' শব্দটি কারও মতে বৈদিক, কারও মতে দেশি, আবার কারও মতে বিদেশি।

তবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'গম্ভীরা' শব্দটির সঙ্গে গামার গাছের পুজোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে গম্ভীরা সূর্যের উৎসব, শিবের নয়। কেননা কৃষিভিত্তিক সমাজে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল সূর্যের পুজো।

সূর্য হোন বা শিব হোন, গম্ভীরা মূলত মালদহ জেলার শক্তিশালী লোকমাধ্যম। একসময় চৈত্র বৈশাখ মাসে টাঙন-তীরের অনেক গ্রামগঞ্জে

গম্ভীরাকে কেন্দ্র করে একটা সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিবাদী ভাষা জনসাধারণকে সচেতন করে তুলত। গম্ভীরা গানের ভাষা ও পরিবেশনা মানুষকে যথেষ্ট আনন্দ দান করত। জনশিক্ষার এই আকর্ষণীয় লোকসঙ্গীত বিপুলভাবে সমাদৃত হত। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির নামে টেলিভিশন ও রিয়ালিটি শো-এর প্রভাবে গম্ভীরা তো বটেই, গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি যেন কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

অথচ এই গম্ভীরাগানই একসময় মালদহের স্বদেশি আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। অধ্যাপক বিনয় সরকার গম্ভীরাগানের ব্যাপক সংস্কার করেছেন। স্বদেশিযুগের বিশিষ্ট গম্ভীরাশিল্পী মহম্মদ সুফি তাঁর গানে বলেছেন-

“পশুর কাজ করাও মানবগণে
সাহেব এই প্রজা কি আছে তোমার লন্ডনে?”

সমীর খলিফার গম্ভীরাগানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসঙ্গে আছে —

“এ যে হিন্দু মুসলমান ছিল এক আসনে যান
গলাগলি পীরিত করত গাইত গম্ভীরাগান।”

গম্ভীরা যে শুধু বিনোদনমূলক সংস্কৃতি নয় তা ড. বিনয়কুমার সরকারের মন্তব্যে স্পষ্ট- "It will be seen that Gamvira does not merely provide amusement for the people with dance, song and music but it largely helps in awakening in the minds of

men those springs of action that are the main causes of the improvement of literature and the fiend ares."[৩]

প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয় প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত দীর্ঘ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, বেদের যুগ থেকেই গম্ভীরার শুরু। তাঁর মতে, গম্ভীরা মূলত শিব উপাসনারই লোকসংস্করণ।[৪] বৈদিক সাহিত্যে ছাড়াও মহাভারত, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, সিংহলি সাহিত্য, তিব্বতীয় সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গাজনের প্রাচীনত্বের পরিচয় মেলে। গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসেবে শিবপুরাণ, হরিবংশ, ধর্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে হরগৌরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গম্ভীরা উৎসব পালিত হত। মহাভারত ও হরিবংশ গ্রন্থে শিবের উপাসনার প্রসঙ্গ আছে। কবি কালিদাস বর্ণিত শিব-পার্বতীর বর্ণনা থেকে সেই সময়ের শৈবশক্তির পরিচয় মেলে। ভারতের অনেক জায়গাতেই হরগৌরীর পাষাণময়ী প্রতিমা ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

টাঙন-তীরের চারটি ব্লকেই গম্ভীরা অনুষ্ঠানের চল ছিল। এখনও আছে। ড. প্রদ্যোত ঘোষ দেখিয়েছেন, মালদহ জেলায় ২৩৪টি গ্রামে গম্ভীরা অনুষ্ঠান হয়। প্রতিবেশী জেলাগুলিতেও এর প্রভাব পড়েছে।

গম্ভীরাগানের চারটি অঙ্গ- ১) চার ইয়ারি ২) শিববন্দনা ৩) একক ও দ্বৈত গান ও ৪) পালাবন্দি।

অনেকে শিববন্দনা শুরুর আগে মুখপাদ ও চার ইয়ারি এবং পরে টণ্টিং, টপ্পা-ঠুংরি ও রিপোর্টিং পরিবেশন করে থাকেন।

মুখপাদ :

মুখপাদের দুটি অংশ। প্রথম অংশকে ধুয়া ও দ্বিতীয় অংশকে চিতানি বলে। ধুয়াগান আড়াই ফেরের ও চিতানিগান দুই ফেরের।

উদাহরণ :

“হামি করি ছাতাপাটি বর্তমানে সবচেয়ে খাঁটি
যেদিক জলের ছাঁট, ঘুরাই ছাতার বাঁট।
এটাই হামার রাজনীতি।”

(তপন হালদার)

১. চার ইয়ারি :

পালাবন্দি গম্ভীরাগানে চারজন শিল্পীর প্রয়োজন হয়। এঁদের মধ্যে একজন দক্ষ অভিনেতা ও উচিত-বক্তা। তিনি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে গম্ভীরার মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করে জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলেন। চারজন ইয়ার-বন্ধুর সাহচর্যে বিচিত্র কৌতুকময় রঙ্গচিত্র প্রথম রচিত হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা’ নাটকে, দাশরথি রায়ের

পাঁচালিতে এর সন্ধান মেলে। এ রকম কাহিনি উপস্থাপনার রীতি গম্ভীরা ছাড়া অন্য কোনও লোকনাট্যে দেখা যায় না।

উদাহরণ :

(১) "চাইকরা মাইয়া করনু বিহ্যা
সুখে জীবন দিবো কাটি,
ছ্যালা ধরা বাসন মাজায়
জীবনটা যে হল মাটি।"

(২) "রাতের বেলা শুয়্যা থাকি
টিনের চালে পড়ে ঢিল,
ডাইন-পেত্নির জ্বালায় হামার
বাঁচা হল মুশকিল।"

(৩) "সুন্দরী দ্যাখ্যা বিহ্যা করনু
বহু ছিল সুন্দর,
ক্যামন কর‍্যা হইয়্যা গেল
বহু হামার বান্দর।"

(৪) "সরকারি লোক বলছে এসে
বাড়ি বাড়ি ঘুর‍্যা,
সাক্ষর নাকি হতে হবে
ল্যাখ্যা-পড়া কর‍্যা।"

(বনমালী বর্মন)

২. শিববন্দনা :

গম্ভীরাসঙ্গীতের প্রথম অংশ বলা হলেও কার্যত দ্বিতীয় অংশ শিববন্দনা। দেবতা হয়েও কৃষক-নেতা বা মোড়ল হিসেবে গম্ভীরার মঞ্চে শিবের আবির্ভাব। বন্দনার মধ্য দিয়ে গম্ভীরার গীতিধর্মী আবেদন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মালদহের গম্ভীরাগানের বন্দনা শুরু হয় "শিব হে" আহ্বানের মধ্য দিয়ে। বন্দনার সময়ে সারাদেহে ছাই মেখে গলায় সাপের প্রতিকৃতি জড়িয়ে মঞ্চে হাজির হন শিব। তাঁর ডান হাতে ত্রিশূল, বাম হাতে ডম্বরু ও মাথায় জটা থাকে। শিবের সঙ্গী হিসেবে কোনও কোনও মঞ্চে বিভিন্ন বেশে দু-তিনজন উপস্থিত হন। এঁদের মধ্যে একজন উচিত-বক্তা থাকেন। এই বক্তার প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিয়ে জনসমক্ষে প্রতিকারের আশ্বাস দেন শিব। এর পরেই "বোম্ ভোলে" বলে আসর থেকে শিব বিদায় নেন।

উদাহরণ :-

"শিব হে করি মিনতি
ত্বরা কর্য্যা আস হে তুমি পশুপতি ॥"

(বনমালী বর্মন)

৩. একক গান ও দ্বৈত গান :

পুরুষ ও মহিলা এই দুটি চরিত্র নিয়ে দুই পর্যায়ের অভিনয় চলে। গম্ভীরায় সাধারণত মহিলার ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করেন। তবে গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে গম্ভীরায় মহিলাদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে। গাজোলের 'রুদ্রবীণা'-র মহিলা শিল্পীরা এই বিষয়ে প্রথম কৃতিত্বের দাবিদার।

উদাহরণ :

একক গান

"ছ্যালা মাইয়ার জ্বালায়, আর তো বাঁচিনা
কুনঠে গেলে পাব সান্ত্বনা। নানা ॥
হামার বউয়ের চলছে বারোমাস্যা
ছ্যালাদের নিত্যি বায়না।
সুন্দরী বউ লিয়া অ্যানু চেহারা পরিপাটি
বছর বছর ছ্যালা হয়্যা শরিল হল মাটি। নানা হে ॥
(আবার) বহুর অসুখ লিয়া হামি ভুগছি কত যন্ত্রণা ॥
অসুখ-বিসুখ অভাব-জ্বালা সংসার থ্যাক্যা ছুটে না।
খ্যাটা খ্যাটা বুড়িয়্যা গেনু, দু'বেলা ভাত জুটে না। নানা হে ॥
এমন কর‍্যা সংসার টানতে আর তো হামি পারি না ॥
শুনেন ওগো দেশবাসী থাকতে হলে হাসি খুশি
একখান ছ্যাল্যা একখানি মাইয়ার বেশি কেহ্ লিও না ॥"

(বনমালী বর্মন)

দ্বৈত গান (ডুয়েট)

"নারী : যাইয়ো না যাইয়ো না বন্ধুরে
বিদেশে যাইয়ো গো প্রাণ।
পুরুষ : কাইন্দো না কাইন্দো বধূগো
কাইন্দিয়া হইয়ো না আকুল ॥
পুরুষ : বিদেশেতে যেতে হবে
নারী : বন্ধু তোমার কামাই কেটা খাবে।
বিদেশের কামাইয়ে কে দিছ্যে দালান,

বিদেশে যাইয়ো না প্রাণ।

পুরুষ : বধূ তুমি আমার অবুঝ বালা

নারী : বন্ধু তুমি আমার গলার মালা।

পুরুষ : তোমার জন্য আনবো আমি
ঝুমকা আর কানেরি দুল
কাইন্দো না কাইন্দো না বন্ধুগো,
কাইন্দিয়া হইয়ো না আকুল ॥"

(বনমালী বর্মন)

৪. টনটিং :

প্রশংসা বা নিন্দাসূচক কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে টনটিং করা হয়। টনটিংকে গ্রাম্য ভাষায় 'কুচ্চা' বলে। শব্দটি 'কুৎসা'র অপভ্রংশ। 'কুচ্চা' শব্দটি অবমাননাসূচক হলেও প্রশংসনীয় কাজের ক্ষেত্রে টনটিং-এ প্রশংসা করা হয়। আবার নিন্দাসূচক কাজের ক্ষেত্রে টনটিং-এ নিন্দাও করা হয়।

উদাহরণ :

"তোমাকে বিহ্যা কর‍্যা
মরলাম জ্বল্যা পুড়্যা।
হামাকে দ্যাখতে গিয়্যা তোমার বাবা
নিল হাঁরগে মাটি খুড়্যা।"

(নিমাই চক্রবর্তী)

৫. টপ্পা-ঠুংরি :

নামে টপ্পা-ঠুংরি হলেও এক্ষেত্রে ধ্রুপদী সঙ্গীতের কোনও স্বাদ মেলে না। বরং গম্ভীরায় টপ্পা-ঠুংরি পর্যায়ে নিন্দা-কুৎসাই মূল আলেখ্য হয়ে ওঠে। খেউড়ের আদলেও গম্ভীরার টপ্পা-ঠুংরি রচিত হয়।

উদাহরণ:

খেউর পর্যায়

“আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা
তুমি আসছো দোঢ়্যা, ষাঁড়ে চঢ়্যা
একদিনেতেই মজা পাও ভোলা ॥
পিন্হ্যা ডোর‍্যাকাটা বাঘছাল,
মাথায় ব্যান্ধাছো জটার জাল।
তুমি ভসম্ মাইখ্যা ফ্যাকম ধর‍্যা,
মুখেতে ভ্যাক্ ভ্যাকম্ বাজাও ভোলা ॥”

(ড. প্রদ্যোত ঘোষ)

উদাহরণ:

টপ্পা পর্যায়

“ভিখারি শিবের সাথে দেব না উমা মাকে
কত কষ্ট পায় যে উমা কৈলাসেতে শিবের সাথে।
দেব না উমা মাকে ॥”

(নিমাই চক্রবর্তী)

• রিপোর্টিং বা সালতামামি :

সারা বছর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সরস আলেখ্যকে রিপোর্টিং বা সালতামামি আখ্যা দেওয়া হয়। বন্দনা বা চারইয়ারিতে সূক্ষ্মভাবে সমস্যার ইঙ্গিত থাকলেও সালতামামি অংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ভালো-মন্দ উভয় দিকই বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে বিস্তার করা হয়। এই অংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

টাঙন-তীরের একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা ডাইনি প্রথা। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বনমালী বর্মনের লেখা একটি রিপোর্টিং

"হে নানা। দেখনা একনা হে বরিনের দিকে চ্যাহ্যা,
(আবার) ডাইন প্রথা নত করল মাথা বের হল যে জীর্ণকায়া।
খাবার খোঁজে ব্যস্ত সবাই শিক্ষার অভাব প্রতি ঘরে,
চেতনার নাইকো বালাই অসুখ হলে এমনি মরে। নানা হে ॥
সম্পত্তির লোভে কেহ আত্মীয়কে ডাইন বলে,
যুগ-জমানা বদল্যা গেছে এমনতর কতই চলে।
(আবার) হত্যা করার সুযোগ খুঁজে ডাইনের অপবাদ দিয়া ॥
সমাজটাকে খ্যাছে খুবলে কেহ-কেহ গুনিন সেজে,
সংস্কারের ভেঙে কপাট দেখছে নাকো কেহ বেজে।
গুনিনের ভাওতাবাজির মুখোশটা দাও উন্মোচিয়া ॥
খেত-খামার পতিত র্যাখ্যা ধর্যাছে সব মদ চুয়ানি,
বাসি মুখেই খ্যাছে কেহ খেজুর খাট্টা আর পচানি ।

দেহে যক্ষ্মারোগ বাসা বাঁধে, অনুকূল পরিবেশ প্যায়া ॥
শিক্ষিত মানুষের কাছে সবাই কিছু আশা করে,
শিক্ষা সাহিত্যে ভালোবাসা পায় যেন প্রতিটি ঘরে ।
আবার বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি দাও সবার কাছে পৌঁছাইয়া ॥”

দুর্গোৎসবের মতোই টাঙন-তীরে গম্ভীরা উৎসব চৈত্রের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। সাহিত্যগুণ, সুরবৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তায় বরিন্দের গম্ভীরা অনেক উঁচু স্থানের দাবিদার। এর কথা, সুর, পরিবেশন-ভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। তাই এখানকার যাত্রায় গম্ভীরাগান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আজও ব্যতিক্রমী।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, হরিদাস পালিত, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব গম্ভীরাগানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এক সময় গম্ভীরাগানকে সমাদর করেছেন ও নানা বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তি।

বরিন্দের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করতে ও সামাজিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে গম্ভীরাগান এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এই সঙ্গীতের মাধ্যমে

ধর্ম, নীতিবোধ সমাজসংস্কার, কুসংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হতে পারে। সমাজচেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গম্ভীরার কোনও বিকল্প নেই।

পাশ্চাত্যসংস্কৃতির দাপটে লোকসংস্কৃতির বেহাল দশা। লোকসংস্কৃতিও পাশ্চাত্যের ধাঁচ অনুসরণ করতে গিয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। এভাবেই লোকসংস্কৃতির প্রকৃত ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বরিন্দের গম্ভীরাগানও সেই পর্যায়ে পড়ে। কোনও কোনও গোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য গম্ভীরাকে ব্যবহার করেন। তাই সেকালের মতো গম্ভীরা আর সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারছে না। ভাষার নিপুণতার অভাব, শব্দপ্রয়োগে শালীনতার অভাব ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতার জন্য গম্ভীরার জনপ্রিয়তা মার খাচ্ছে।

একসময় গম্ভীরা সংক্রান্ত প্রচারে মালদহের 'মালদহ সমাচার' পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।[৫] কয়েকটি পত্রিকা ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় গম্ভীরাগানের ঐতিহ্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলছে। গম্ভীরাসঙ্গীত আঞ্চলিক জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তবে এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজোড়া বিভিন্ন বিষয় পরিবেশন করার সুযোগ থাকায় জনগণের তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে তার কদর বেড়েছে। কিন্তু তথাকথিত গম্ভীরার লৌকিক আদল ছেড়ে বেরিয়ে আসা ও আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া গম্ভীরাগান আদৌ স্থায়িত্ব পাবে না।

বরিন্দের এই মাটির সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে চাই সমবেত আন্তরিক প্রয়াস। নইলে গম্ভীরাগান অচিরেই আধুনিকতার মোড়কে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে।

বরিন্দ এলাকার চারটি ব্লকেই গম্ভীরাগান অতি জনপ্রিয়। হবিবপুরের আইহো গ্রামে বৈদ্যনাথ হালদার গম্ভীরাগান পরিবেশন করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এই গ্রামেরই মণ্টু পাল, তুলসী পাল, তারাপদ লাহিড়ি, নিতাই দাস, সিদ্দিক সেখ, ইন্দ্রদমন শেঠ প্রমুখ গম্ভীরার বিশিষ্ট শিল্পী। গাজোলের উপেন মণ্ডল, বনমালী বর্মন, নিমাই চক্রবর্তী, সুমৌমী পান, বিজিত দাস, এণাক্ষী দাস প্রমুখ দলগত ভাবে গম্ভীরাকে একটা রুচিশীল মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন। ছোটদের মধ্যে ঋত্বিক বর্মন, মধুরিমা দাস ও লীনা কিস্কু গম্ভীরার জনপ্রিয় শিল্পী।

গাজোলের 'রুদ্রবীণা' আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত গম্ভীরা পরিবেশন করে থাকে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানচেতনা, পরিবেশ রক্ষা, তথ্যের অধিকার প্রভৃতি বিষয় গম্ভীরাগানের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এ সংস্থার শিল্পীরা । বরিন্দের সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন সাহা, বনমালী বর্মন প্রমুখ গম্ভীরাগানের খ্যাতিমান গীতিকার। বৈদ্যনাথ হালদার, নিমাই চক্রবর্তী প্রমুখ গম্ভীরার সুর সৃষ্টিতে মগ্ন থাকেন। হবিনগরের দুর্লভ বিশ্বাস তাঁর গম্ভীরায় সব রকম বিষয় উপস্থাপন করেন।

বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে গম্ভীরাগান পরিবেশিত হয়, গাজোলের ভবানীকোঠা, ফতেপুর, ধ্যামধেমা, হাতিন্দা, বামনগোলার বোদরা, হবিবপুরের বুড়িতলা, আইহো প্রভৃতি এলাকায়।

আইহোর গোপাল দাস ও সম্প্রদায় শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গম্ভীরা শুনিয়েছিলেন।[৬]

২) চণ্ডীমঙ্গলের গান :

টাঙন-তীরের অন্যতম লোকসংস্কৃতি মঙ্গলচণ্ডীর গান। একসময় এই এলাকায় গৃহস্থবাড়ির বার্ষিক মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান ছিল এই গান। তবে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় অধুনা এর চল কমেছে।

রাজবংশি, পলিয়া ও দেশি সম্প্রদায়ের বিয়ের সময় অষ্টমঙ্গলা গাওয়ার রীতি এখনও এই এলাকার কোনো কোনো পরিবারে দেখা যায়। এই অষ্টমঙ্গলা বিয়ের দ্বিরাগমন অনুষ্ঠান নয়, আটদিন-আটরাত ধরে চলতে থাকা চণ্ডীমঙ্গলের গান। শেষের দিন মাতৃমুখোশ পরে আয়োজককে নাচতে হয়। যে-মন্দিরে ঘট বসিয়ে পুজো করা হয় তার চতুর্দিকে আয়োজক-গৃহস্থ পরিক্রমা করেন।

পালা-অনুষ্ঠান হিসেবেও মঙ্গলচণ্ডীর গান পরিবেশিত হয় কোনও কোনও জায়গায়। গাজোলের করিমগঞ্জের চৈতন্য বর্মন, বামনগোলার বারিন্দার গোকুল মণ্ডল ও রূপচরণ মণ্ডল চণ্ডীমঙ্গল পালার জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। পাকুয়ার বাহাদিপুর গ্রামের কিষাণ মণ্ডল ও উত্তম রায় মঙ্গলচণ্ডী-পালার খ্যাতিমান পরিবেশক।

টাঙন-তীর থেকেই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের কয়েকটি পুঁথি উদ্ধার করেন ড. সুনীলকুমার ওঝা।[৭]

৩) মনসাগান :

মনসাগান বা বিষহরিগান টাঙন অববাহিকার প্রধান ও জনপ্রিয় লোকগান। মঙ্গলচণ্ডীর গানের মতোই মনসামঙ্গলের গান দলগত মহড়ার ফসল। তিন দিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত এই গান চলে। কোনও কোনও পরিবারের বার্ষিক উৎসবের রূপ নিয়েছে এই পালাগান।

মনসামঙ্গলের চিরাচরিত কাহিনির নাট্যরূপ দেন পালাকারেরাই। পুরুষেরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁদেরই বিকৃত কণ্ঠে অনুরণিত হয় সনকা বা বেহুলার আর্তনাদ।

মনসামঙ্গলের পালাকে জনপ্রিয় ও পরিসরে বড় করার জন্য আজকাল চটুল বাংলা-হিন্দি গান সংযোজন করা হয়। সিন্থেসাইজার, অক্টোপ্যাড প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র মনসাগানে ঢুকে পড়েছে। কখনও কখনও আদি রসাশ্রয়ী কৌতুকও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে ধর্মকেন্দ্রিক গান বলে এর অশ্লীলতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। এই পালায় কৌতুক-অভিনেতার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

পালা পরিবেশনের শুরুতে ঈশ্বরবন্দনার পাশাপাশি গানের মাধ্যমে আয়োজকেরও প্রশংসা করা হয়। শেষের দিন সূর্যালোকে পালা শেষ করতে

হয়। টাঙন-তীরের কয়েকটি এলাকায় মনসার পাকা মন্দিরের অবস্থান। বেশির ভাগ মন্দিরে নিয়মিত পূজো হয় ও বার্ষিক মনসাগানের আয়োজন করা হয়।

বরিন্দ এলাকার প্রাচীনতম মনসামন্দির গাজোলের ময়নায় অবস্থিত। সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফেরাতে স্বর্গে যাওয়ার জন্য নদীপথে ভেলায় পাড়ি দেন। কথিত আছে, ময়নার ঘাটে নেতা ধোপানীর সাক্ষাৎ পান বেহুলা। এখান থেকেই বেহুলা কৈলাস যাত্রা করে স্বামীসহ ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই সংবাদ পেয়ে চম্পকনগর থেকে সপ্তডিঙা সাজিয়ে চাঁদ রওনা হন। পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য । পথে এই ময়নার ঘাটেই রাত্রিবাস করার সময় স্বপ্নাদেশ পান চাঁদ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদ ময়নাতেই নাকি মনসার পূজো দেন। ফি-বছর আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে সপ্তাহ ব্যাপী এখানে পুজো ও মেলার আয়োজন হয়। প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। ভিনরাজ্য থেকেও অনেকে আসেন।

বামনগোলার রাখালপুকুর, নালাগোলা, পাকুয়া, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী, কেন্দপুকুর, আইহো, পুরাতন মালদহের সাহাপুর, বাচামারি, গাজোলের দেওতলা, কাটনা, আহোড়া, মশালদিঘি প্রভৃতি এলাকায় এই পালাগানের বার্ষিক আসর বসে। নিয়মিত চর্চা হয়। বরিন্দের এমন কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত নেই যেখানে মনসাগান হয় না।

পুরাতন মালদহের মানুষদের বিশ্বাস, বেহুলা এখান দিয়ে নদীপথে মৃত স্বামীকে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। তাই এই এলাকায় বিধবার সংখ্যা বেশি।

বিলকাঞ্চনের সঞ্জীব মাহাতো, হবিনগরের শ্যামল সরকার, মুদাফৎ হবিনগরের মনোমোহন মণ্ডল, খোকসনের রাখাল ঘোষ প্রমুখ দলগত ভাবে মনসাগান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন।

৪) কীর্তন :

কীর্তনের দুটি ধারা- নামকীর্তন ও পদকীর্তন। স্বল্প সময়ের কীর্তনের আসরে শুধুই নামকীর্তন পরিবেশিত হয়। মূলত অষ্টপ্রহরের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু চব্বিশ প্রহর থেকে এক শো কুড়ি প্রহর পর্যন্ত যেসব কীর্তনের আসর বসে সেখানে পদাবলি কীর্তন পরিবেশিত হয়। বরিন্দ এলাকায় পদাবলি কীর্তনের কয়েকটি দল আছে। সমবেত ভাবে নামকীর্তন টাঙন-তীরের বেশির ভাগ গ্রামেই চলে।

হবিনগরের প্রফুল্লকুমার রায় পনেরো বছর ধরে পদাবলি কীর্তন পরিবেশন করছেন। বাইরের অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রণ পান। এই এলাকারই দীপালি মণ্ডল ও ফুলমালা রায় পদাবলিতে সুনাম অর্জন করেছেন। চাকনগেরর সুভাষচন্দ্র মণ্ডল বাঁশিতে ও গৌরচন্দ্র মণ্ডল মৃদঙ্গে সহায়তা করে কীর্তনের আসরকে বেশ রসঘন করে তোলেন। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, এমন-কী রাজ্যের বাইরেও আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান করেন। নালাগোলার পরেশ শীল উদাত্ত কণ্ঠে বৈঠকি কীর্তন পরিবেশন করেন। হারমোনিয়াম বাদনেও তিনি দক্ষ।

চাঁদা তুলে শুধু গ্রামেরই নয়, শহরমুখী জনপদগুলিতেও কীর্তনের বার্ষিক আসর বসে। এজন্য এই সব এলাকায় নাটমন্দির গড়ে উঠেছে। কয়েকটি জায়গায় হরিমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও দুর্গামন্দিরকে কেন্দ্র করে পদাবলি কীর্তন আয়োজিত হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের বৈষ্ণব পদ কীর্তনের ভক্তিরসের স্রোতে টাঙন-তীরের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। পদাবলি কীর্তন শুরুর আগে প্রথা মেনে গৌরচন্দ্রিকা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা করা হয়। বাড়িতে কোনও কোনও শুভ অনুষ্ঠানে নাম-কীর্তনের দলকে আহ্বান করা হয়।

টাঙন-তীরের অনেক গ্রামে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের আধিক্য। এঁরা তাঁদের কুলগুরু হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীর মূর্তি স্থাপন করে হরিসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের মহানন্দ হালদার, তারকচন্দ্র সরকার, বিজয় সরকার, অশ্বিনী গোঁসাই প্রমুখের পদ এঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। কোথাও কোথাও কীর্তনের শুরুতে ভাগবত পাঠ করা হয়। নালাগোলার মহাদেব মণ্ডল, আনন্দ সরকার, গাজোলের সুধাংশু পাল, নিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ ভাগবত পাঠে দক্ষ।

৫) বাউলগান :

ঈশ্বরভাবনায় দেহে ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠাই বাউল সাধকদের মূল লক্ষ্য। তবে বাউলগান এখন অন্যতম জনপ্রিয় লোকগান। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে দেহতত্ত্বমূলক এই গান পরিবেশিত হয়। কোমরে

ডুগডুগি, পায়ে মল ও পরনে গেরুয়া পোশাক পরে বাউলরা উচ্চগ্রামে এই গান গেয়ে চলেন। একই সঙ্গে পদগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই জাত-বাউল নন।

বরিন্দের চারটি ব্লকেই বাউলগানের ব্যাপক প্রভাব আছে। গাজোলের শিক্ষকপল্লীতে ফি-বছর বৈশাখ মাসে আট দিন ধরে বাউল অনুষ্ঠান হয়। এখানকার পাইল শ্মশান, কদুবাড়ি শ্মশান, কৃষ্ণপুর, রানিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় প্রতি বছর বাউল উৎসবের আয়োজন করা হয়। কাটিকান্দরে শিবরাত্রি থেকে সপ্তাহব্যাপী বাউল উৎসব চলে। পাকুয়ার গোবরাকুড়িতে এই জনপদের বৃহত্তম বাউল মেলা বসে। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। বাউলশিল্পী শঙ্কর চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা।

কাটিকান্দরের গোকুল রায়, চন্দ্রকুমার বর্মন, শিক্ষকপল্লীর প্রশান্ত সরকার প্রমুখ বাউলগানের প্রোথিতযশা শিল্পী।

৬) খনগান :

খনগান প্রকৃতপক্ষে লোকযাত্রা। স্থানীয়ভাবে রাজবংশি, পলিয়া ও দেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গান প্রচলিত। একই ভাষাভাষি অন্যান্য সম্প্রদায়ের, এমন-কী মুসলমানেরাও এই গানে অংশ নেন। গম্ভীরা ও আলকাপের মতো খনেও তাৎক্ষণিক সংলাপ থাকে। উৎসগত ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এই গানের চল বেশি থাকলেও মালদহের টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে এই পালা

চর্চিত হয়। বুলোসরি, ঢাকোসরি প্রভৃতি ঐতিহ্যনির্ভর পালা খনে পরিবেশিত হয়। আজকাল চটকদারি নাম দিয়ে খন উপস্থাপিত হচ্ছে। 'লাইনার পিস্টন, নজেল মার্ডার' এমনই একটি চটকদারি পালার দৃষ্টান্ত।

গাজোলের শিবাজিনগরের নরেন সরকার, ভবানীকোঠার সুবোধ সরকার, ধ্যামধামার মিশন সরকার খনগানের বিশিষ্ট শিল্পী।

৭) আলকাপ গান :

মূলত মুর্শিদাবাদের অন্যতম লোকগান আলকাপ। কিন্তু টাঙন অববাহিকা অঞ্চলেও এর চর্চা আছে। আলকাপের আঙ্গিক হিসেবে কোনও পুজোপার্বণ অনুষ্ঠিত হয় না। আলকাপ কার্যত ব্যঙ্গরঙ্গরসে পরিপূর্ণ লোকপালা। বলা হয়, অবিভক্ত মালদহ জেলার শিবগঞ্জ থানার মনাকষা গ্রামে এর সূচনা। কুশীলবেরা সবাই পুরুষ। পুরুষেরাই নারী সেজে অভিনয় করেন। আলকাপের ভাষায় এঁরা ছোকরা। এঁদের বিপরীত পুরুষ চরিত্রকে ক্যাপাল বা লাব্বার বলে। এঁর উপরে দলের সুনাম-নির্ভর করে। বন্দনাগায়ক দলকে পরিচালনা করেন। এঁকে 'সরকার' বলা হয়। সহকারী নটনটী থাকে। আসরে যাঁরা তবলা, হারমোনিয়াম ও করতাল বাজান তাঁরাও কোরাস ধরেন। এঁদের দোহারি বলে।

বন্দনা অংশে দেবতা ও বাস্তবজীবন দুই-ই প্রাধান্য পায়। যেমন —

ক) "উমা ভবতারা —

শ্রীচরণে স্থান দাও মা তারা।" *(দেববন্দনা)*

খ) "লালটোন হ্যাজাগ লাগবে না ভাই স্বাধীন প্রাঙ্গণে
ও তাই শোনা যায় কানে।" *(বৈদ্যুতিক বাতির প্রেক্ষিতে)*

বাঁশ দিয়েও বন্দনা রচিত হয় —

"ধন্য বাঁশের বলিহরি তাই করব রচনা,
বসে শোনেন গো শোনেন দশজনা।
বড় গুনের জিনিস দাদা
নামটি তাহার বাঁশ,
ঘর-দুয়ারে দেখ তো মোদের
হচ্ছে কত কাজ গো।
ঝাঁপ-টাটি আর হচ্ছে খুঁটি
বলছি কথা খাঁটি খাঁটি।
সারক-সূতা বাওনা প্যালা
ঝড়ের বলে সামলায় ঠেলা।
কত খোয়াড়মারা খাদ
পশুপাখির মারে জানগো।
কৃষ্ণের হাতে মোহন বাঁশি,
ইদুঁর মারা হয় গো ফাঁসি
ভূমিষ্ঠকালে ছেলের কাটে নাড়ি

এবং বাঁশের খায় তরকারি।”

বন্দনার পরে শুরু হয় খেমটা। সাধারণত ছোকরা ও ক্যাপালই এই গান করেন। অন্য কুশীলবও অংশ নেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া নিয়ে তরজা চলতে পারে। নারীস্বাধীনতাকেন্দ্রিক নানা বিষয় বিনোদনমূলক খেমটায় ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের বীরেন সরকার, বুধু সরকার, বাক্কার সরকার, ভগা সরকার প্রমুখের রচনা করা পালা টাঙন-তীরের গ্রামগুলিতে পরিবেশিত হয়। হবিবপুরের ঋষিপুর গ্রামের বলরাম সরকার ও নন্দদুলাল মণ্ডল দলগত ভাবে আলকাপ ও পঞ্চরস পরিবেশন করেন।

তবে আলকাপ ও পঞ্চরস এক জিনিস নয়। সাধারণত সামাজিক, পুরাণকেন্দ্রিক কোনও বিষয় নিয়ে আলকাপের পালা রচিত হয়। ইসলামি চরিত্র থাকে না। খলনায়ক-খলনায়িকাও নায়ক-নায়িকার মতোই প্রাধান্য পান। কাহিনিকেন্দ্রিক পালাকেই ‘কাপ’ বলা হয়। এই কাপের শেষে সময় বাঁচলে চটুল নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। সারারাত ধরে এই পালাগান চলে।

৮) ভাওয়াইয়া :

কোচবিহারে ভাওয়াইয়া গান সর্বাধিক প্রচলিত। কিন্তু মালদহের টাঙন-তীরেও ভাওয়াইয়ার আংশিক বিকাশ ঘটেছে। দরিয়া ও চটকা এই দুটি ধারাতেই এখানকার শিল্পীরা পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। রাজবংশি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাওয়াইয়া। তবে যথেষ্ট রাজবংশি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ থাকা

সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্তের এলাকা বলে এখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভাওয়াইয়াশিল্পী নেই।

ফতেপুরের ভবতোষ সরকারের ভাওয়াইয়া দল, ধ্যামধামার বৈশিষ্ট্য সরকারের ভাওয়াইয়া দল, আহোড়ার টুম্পা বর্মনের ভাওয়াইয়া দল এই জেলায় খ্যাতিলাভ করেছে। রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতাতে এখানকার কয়েকজন শিল্পী এককভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

৯) যাত্রাপালা :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে দু-ধরনের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয় - ক) শখের যাত্রা ও খ) পেশাদারি যাত্রা।

ক) শখের যাত্রা :

এ এলাকার বিভিন্ন গোষ্ঠী, ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কখনও কখনও শখের যাত্রা পরিবেশন করে। কোনও পুজো বা উৎসবকে কেন্দ্র করে এই যাত্রা পরিবেশিত হয়। এখানকার শখের যাত্রার বৈশিষ্ট্য : (১) নারীচরিত্র বাইরে থেকে ভাড়া করা হয়। (২) বাদ্যযন্ত্রীরাও বাইরের। (৩) পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালার ক্ষেত্রে পোশাক ভাড়া করা হয়। ও (৪) চরিত্রগুলির কুশীলবদের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকে।

খ) পেশাদারি যাত্রা :

উৎকর্ষের বিচারে নিচুমানের হলেও এই এলাকায় কয়েকটি পেশাদারি যাত্রাদল আছে। আদিবাসী যাত্রাও এর আওতায় পড়ে। গ্রাম্য মেলা, কোনও ধর্মীয় উৎসব বা নিছক যাত্রানুষ্ঠানেও এই দলগুলি ডাক পায়। এই ধারার যাত্রার বৈশিষ্ট্য : (১) নারীচরিত্র ভাড়া করা হয় না। (২) নিজস্ব সংগতকার থাকে। (৩) অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের প্রত্যেকেই যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। নির্দিষ্ট নাট্যবিষয়ের পাশাপাশি চটুল নাচ-গান পরিবেশিত হয়। (৫) বেশভূষার শৈথিল্য থাকে। (৬) অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংলাপ থাকে না।

এই এলাকার গীতাঞ্জলি যাত্রা সংস্থা, নবরঞ্জন নাট্যসংস্থা, রঙ্গম গোষ্ঠী পেশাদারি যাত্রা পরিবেশন করে। নিমাই মহলদার পরিচালিত নবরঞ্জন নাট্যসংস্থা 'রাজা হরিশচন্দ্র' 'মুর্শিদাবাদের নবাব' প্রভৃতি পালা পরিবশেন করে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে।

১০) অন্যান্য ধারার লোকগান ও পালাগান :

পুরাতন মালদহে ভাজোইগীতি, ঠিকরিকুটার গীতি, সান্‌ঝাগীতি প্রচলিত আছে। বামনগোলায় জিতাষ্টমীর গান, হোলিগীত, ছুটগীত, বোলাইগীতি, হবিবপুরে আলইগীতি ও গাজোলে গোয়াল-লাঠি খেলাগীতি প্রচলিত আছে। লুপ্তপ্রায় এইসব লোকগান সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হলে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির জলবায়ুতে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

এই ধারার কয়েকটি লুপ্তপ্রায় গান :

ক) ভাজোই গীতি (মহাদেবপুর, পুরাতন মালদহ)

"ভাজোইদিদি শুনো না তোমার কাণ্ডকারখানা,
বলবো কী বলিতে মন করে না,
গিয়াছিনু জমিতে জমি চষিতে
রোদে তাপে পাও চলে না।
এই ঘোর কলিকালে গেল দেশ রসাতলে
এই অনাবৃষ্টির ফলে,
বলবো কী বলিতে মন করে না।
ভাজোইদিদি শুনো না তোমার কাণ্ডকারখানা ॥"[৮]

খ) ঠিকরিকুটার গীতি (সাঙ্গাইল, পুরাতন মালদহ):

"আগা দিগার ভিটাখান ধুলধুল মাটি
তাতে বসিছে সেকারিয়া হাটি।
সেকারিয়া ভাইরে সেকা দিত ধারে
নিন্দ রাজার বেটার বিহা শনি-মঙ্গলবারে।
মা মোর জলশরী কি খলইশরী
বারে বারে মাঙছু মুই জলশরী কি জলশরী ॥"[৯]

গ) সান্ঝা গীতি (আইহো, পুরাতন মালদহ) :

"বারেবারে মানা করি

স্যান্‌ঝ্যা সুন্দরী টে,

না যাইও ছ ঘাটেতে স্যান্।

ছ ঘাটেতে আছে রে

দরবারের পোহ্‌রা রে ॥”[১০]

ঘ) জিতাষ্টমীর গীত (জামতলা, বামনগোলা) :

“খোক পেঁচা পুজিতে হামার

কিবা কিবা লাগে

সোনার চালন বাতি

ঝলবল করে রে...... ।

খোক পেঁচা, খোক পেঁচা

না করিস তুই হেলা

তোক মুঁই পুজা দিম

কাইল দিপুর বেলা......॥” [১১]

ঙ) ছুটগীত (জিগিন, গাজোল) :

“ওহে কলমু লতা,

জল শুকালে যাবেন কোথা।

তুমি নাও ঝাড়ি হাতে,

আমি নিই কলসি কাঁখে,

চল যাই বান্ধা ঘাটে।

শ্বশুরে খায় তামাক,

ভাসুরে বাড়ায় হাত,

সভার মধ্যে পণ্ডিত নাই।

বিচারে করবো কাত ॥”[১২]

চ) বোলাইগীতি (পাকুয়া, বামনগোলা) :

“মোর বুঝি আর বিহা হবি না,

তেলি পাড়ার ওই মরারা

তিয়ার বিহা দিলি ভাঙাইয়া

মোর বুঝি আর বিহা হবি না।

কত দিনের আশা গেল মোর ফুরাইয়া

মরারা আসিয়া দেলি সব কইয়া

মোর বুঝি আর বিহা হবি না,

বিধিরে, মোর বুঝি আর বিহা হবি না ॥”[১৩]

ছ) আলইগীতি (দাল্লা, হবিবপুর) :

“ও গিরি, ও গিরি,

বার করে দাও সোনার পিঁড়ি।

সোনার পিঁড়িতে বসবে কে?

বাস্তু ঠাকুর এসেছে।

বাস্তু ঠাকুর দিল বর।

বর বর বর বাস্তের বর,

ধান-চাল দিয়া গোলা ভর ॥”[১৪]

জ) গোয়াল-লাঠি খেলা গীতি (কামারডাঙা, বামনগোলা) :

“বেগুন বাড়ির ধুলধুল মাটি,

ননদ-ভাজে গলায় কাঠি।

ননদ-ভাজে কোটে ধান,

খাবার বেলা ধান বাটান। হোঃ হোঃ হোঃ

উছল কুমড়া উছল ধায়।

আমার গোয়ালা খেল দেখায়.....॥” [১৫]

লোকগান-পালাগানে টাঙন-তীরবর্তী জনপদ এতই ঋদ্ধ যে বছরের প্রত্যেকটি মাসেই শুধু লোকসুরের ঝংকার ধ্বনিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা — সুস্মিতা সোম, ১ম প্রকাশ ২০০৬, দীপালি পাবলিশার্স, চাঁচল, মালদহ পৃষ্ঠা-১৬৫

২. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০ পৃষ্ঠা-০২

৩. The Folk Element in Hindu culture — Binay Sarkar.

৪. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০ পৃষ্ঠা-০৩

৫. আদ্যের গম্ভীরা — হরিদাস পালিত। ড. ফণী পাল সম্পাদিত ২য় সং. ১৪১০ পৃষ্ঠা- VI

৬. ই-টিভি বাংলা, অনুষ্ঠান 'যাচ্ছি', ০৯/০৭/২০০৫, সময় রাত - ১১.০৫

৭. মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল — সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৪

৮. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৪৬

৯. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৫১

১০. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৪১

১১. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৭২

১২. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৮১

১৩. জোয়ার, ৩৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, মালদহ পৃষ্ঠা-৮৭

১৪. সেমিনার নিবন্ধাবলী : বাংলার লৌকিক অভিকরণ শিল্পকলা ও লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনাচক্র, ফেব্রু. ২০০৮, ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোশিয়েশ্যান অব ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা-১৪২

১৫. টাঙন অববাহিকায় অর্ধশতাব্দী (প্রবন্ধ) — অতুলকুমার মণ্ডল, কামারডাঙা, পাকুয়াহাট, মালদহ। লেখকের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত।

• সূত্র-ক্রমাঙ্কহীন গানগুলি গাজোলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রুদ্রবীণা'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।